Department of Political Science

Local Government in West Bengal

SEM-VI

DSC-3

Anirban Das

৭৩ এবং ৭৪ তম সংবিধান সংশোধন আইন

রাজস্ব যুক্তরাষ্ট্রিকতা ও স্থানীয় সরকারের ভূমিকা

জন্ম হল নীতি আয়োগের

বহুস্তর বিশিষ্ট সরকারি ব্যবস্থাপনাকেই যুক্তরাষ্ট্র বলে। একটি যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ব্যয় সংক্রান্ত ও অন্যান্য আর্থিক দায়দায়িত্ব বন্টন বা বিভিন্ন সরকারের মধ্যে আর্থিক ব্যবস্থাপনার হস্তান্তরের মধ্যেই নিহিত রয়েছে রাজস্ব যুক্তরাষ্ট্রিকতা। অর্থাৎ আর্থিক যুক্তরাষ্ট্র তত্ব বা আর্থিক বিষয়ে সরকারের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে সমন্বয়ের নির্যাস। সরকারের বিভিন্ন স্তরে দক্ষতার সঙ্গে ন্যায্য সহায়সম্পদ বরাদ্দের সঙ্গে সঙ্গে আর্থিক দায়িত্ব বন্টনের মাধ্যমে একটি স্থিতিশীল যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গড়ে তোলাই একটি আদর্শ যুক্তরাষ্ট্রীয় আর্থিক ব্যবস্থাপনার মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। প্রাথমিক ভাবে শুধুমাত্র কেন্দ্র ও রাজ্যগুলিকে নিয়ে গঠিত হয়েছিল ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র। কিন্তু ৭৩-তম এবং ৭৪-তম সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানে যুক্ত হয় নবম এবং নবম-এ অংশ। সৃষ্টি হয় সরকারের তৃতীয় স্তর --- ত্রিস্তর বিশিষ্ট পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠান। পঞ্চায়েতি রাজ ব্যবস্থার হাত ধরেই ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র প্রকৃত অর্থেই বহুস্তর বিশিষ্ট যুক্তরাষ্ট্র হয়ে উঠল, যার সঙ্গে যুক্ত হয় বহুস্তরীয় সরকারি আর্থিক দায়দায়িত্ব। ১৯৯৪ সালে এই সংশোধনী আইন পাশ এবং রাজ্যগুলির তরফে এই সংশোধনীর সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ আইন কার্যকর করার পর কুড়ি বছরেরও বেশি সময় পেরিয়ে গিয়েছে। এটি নিঃসন্দেহে আর্থিক বিকেন্দ্রীকরণের পথে এক বড় পদক্ষেপ। এর মাধ্যমে স্থানীয় গণতান্ত্রিক প্রশাসন গড়ে তোলার পথে জনসাধারণের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে এক গণতান্ত্রিক পরিসর গড়ে তোলা যাবে।

আর্থিক বিকেন্দ্রীকরণ নীতির মূল ভিত্তিই হল স্থানীয় স্বশাসিত সরকারগুলির আর্থিক ক্ষমতায়ন। এ বার যে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটির উত্তর খোঁজার প্রয়োজন তা হল সংবিধানের ২৪৩ জি এবং ২৪৩-এর ডবলু-এর বিধানমতো স্থানীয় স্বশাসিত সরকারগুলি কি 'আর্থিক বিকাশ ও সামাজিক ন্যায়ের দিশা' দেখানোর লক্ষ্য নিয়ে স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করছে? এত দিন সংবিধান বর্হিভূত প্রতিষ্ঠান হিসাবে যোজনা কমিশন কাজ করছিল। এটিকে ভেঙে দিয়ে ২০১৫-র ১ জানুয়ারি থেকে নতুন প্রতিষ্ঠান নীতি (ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর ট্রান্সফরমিং ইন্ডিয়া) আয়োগ গঠন করা হয়েছে। যার অন্যতম কাজ স্থানীয় সরকারকে আর্থিক ভাবেও স্বনির্ভর করে তোলা।

আর্থিক ক্ষমতা ও দায়দায়িত্ব বণ্টনে অসাম্য

রাজ্যের হাতে আরও বেশি আর্থিক ক্ষমতা প্রদানের দাবি নতুন কিছু নয়। ষাট-সত্তরের দশক থেকে মুখ্যমন্ত্রীরা এই দাবি তুলেছন। এমনকী কেন্দ্র ও রাজ্যে একই সরকার থাকাকালীন এই দাবি উঠেছে। ফলে সময় এসেছে বিষয়টি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখার।
নীতি আয়োগ কার্যকর হওয়ার পর কি তবে সংবিধানের ২৪৩ জেড ডি অনুচ্ছেদ অনুযায়ী গঠিত সাংবিধানিক সংস্থা অর্থাৎ জেলা পরিকল্পনা কমিটিগুলিকে নতুন দায়িত্ব দেওয়া বা এগুলিকে নতুন করে গড়ে তোলার কথা ভাবা হচ্ছে ? এই হস্তান্তর প্রক্রিয়াকে যুক্তিসঙ্গত করতে কী কী সংস্কার প্রয়োজন ? স্থানীয় স্বশাসিত সরকারগুলির ক্ষেত্রে আর্থিক ক্ষমতা বণ্টনের নীতি নিয়ে নতুন করে ভেবে দেখার প্রয়োজন রয়েছে। ভারতে সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রের যে আদর্শ গড়ে উঠেছে বিশ্বের অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রে তার দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে না। এ দেশের নতুন সরকারও এই সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রের আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং একে বজায় রাখতে অঙ্গীকারবদ্ধ। জার্মানি বা দক্ষিণ আফ্রিকার দৃষ্টান্তই ধরা যাক। এই দুই দেশে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা থাকলেও ফেডেরাল বা কেন্দ্রীয় সরকারই প্রধান প্রধান নীতি নির্ধারণ করে এবং সরকারের অন্যান্য স্তর নিছকই রূপায়ণকারী ভূমিকা পালন করে। ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ব্রাজিলের মতোও নয়। ব্রাজিলে সরকারের তিনটি স্তর সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, স্বশাসিত এবং সমান মর্যাদার অধিকারী। এই তিনটি স্তরই তাদের নীতিগত বিষয়ে সমান্তরাল ও উলম্ব ভাবে পরস্পরের সঙ্গে সমন্বয় রক্ষা করে চলে। ভারতকেও অবশ্যই সহযোগিতামূলক গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে 'মার্বেল কেক মডেল' বলা যাবে না। এমনটাও বলা যাবে না যে এখানে বিভিন্ন স্তরের আর্থিক দায়িত্বের মধ্যে বিরোধ দেখা দিচ্ছে না বা এখানে সরকারের সমস্ত স্তরকেই সমান বলে বিবেচিত করা হচ্ছে। কেন না এখানে প্রকৃত অর্থেই সরকারের অনেক স্তরকেই সমান অংশীদার হিসাবে বিবেচনা করা হয় না। আসলে যুক্তরাষ্ট্রের জন্মলগ্ন থেকেই কেন্দ্রের দিকে পাল্লা ভারী।
শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার গড়তে গিয়ে রাজ্য ও স্থানীয় সরকার স্তরে আর্থিক ক্ষমতা ও দায়দায়িত্ব বণ্টনের ক্ষেত্রে অনেক অসাম্য রয়ে গিয়েছে।

অনুসরণ করতে হবে সহযোগিতার নীতি

যুক্তরাষ্ট্রে বাস্তবোপযোগী সচল আর্থিক ক্ষমতা বণ্টন ব্যবস্থা গড়ে তোলার অন্যতম শর্ত হল সরকারের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে কাজকর্ম, দায়দায়িত্ব ও নিয়ামক ক্ষমতার সমবণ্টন। 'কে কোন কাজ করবে' এবং 'কে কোথায় কী কর নেবে?' এই দু'টি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের ভিত্তিতে এই ক্ষমতার বণ্টন হওয়া উচিত। পিছন ফিরে তাকালে দেখা যাবে ভারতে এই প্রশ্নগুলি কখনও ওঠেনি, আর তাই সেগুলির সন্তোষজনক উত্তর খোঁজার চেষ্টাও হয়নি। ব্যয় সংক্রান্ত দায়িত্ব, রাজস্ব সংক্রান্ত দায়িত্ব তথা নিয়ামক কাজকর্মের ক্ষমতা বণ্টনের ক্ষেত্রে সব চেয়ে সহজ ও প্রাসঙ্গিক নীতিটি হল সহযোগিতার মৌলিক সূত্রটি অনুসরণ করা, যেখানে বলা হয়েছে, যে বিষয়টি একটি বিশেষ স্তরেই সব চেয়ে সুচারুভাবে সম্পন্ন করা যাবে (অবশ্যই লেনদেন সমন্বয় কার্যের ন্যূনতম ব্যয় ধরে) সেই বিষয় সেই বিশেষ স্তরের প্রতিষ্ঠানগুলির হাতেই ছেড়ে দিতে হবে, তার চেয়ে উঁচু স্তরে নিয়ে যাওয়া চলবে না। অন্য ভাবে বলতে গেলে সরকারের উঁচু স্তরের হাতে বিশেষ কাজের দায়িত্ব দিয়ে নির্ভরযোগ্য দৃষ্টান্ত তৈরি করতে হবে। 'স্বশাসনের' কথা বললেই অনেকেই নস্টালজিক হয়ে বৈদিক যুগের পঞ্চায়েত ব্যবস্থার উদাহরণ হয়তো দেবেন, কিন্তু ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকারই স্থানীয় স্তরে ক্ষুদ্র প্রজাতন্ত্র গড়ে সেগুলিকে স্বায়ত্তশাসনের প্রতিষ্ঠান করে তুলতে চেয়েছিল। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন এবং সেই সঙ্গে প্রাদেশিক স্বশাসনের সূচনা পুরসভা ও গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে গণতান্ত্রিক পরিসর গড়ে তোলার কাজ কয়েক পদক্ষেপ এগিয়ে নিয়ে গেছে। এ কথা আমাদের সকলের জানা যে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের মতাদর্শের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল গ্রাম পঞ্চায়েতের ধারণা এবং গান্ধীজিও আগামী ভারতের সামাজিক জীবনের ভরকেন্দ্র হিসাবে তুলে ধরেছিলেন তাঁর 'গ্রাম স্বরাজের' ভাবনা। কিন্তু ভারতীয় সংবিধানে শুধুমাত্র ৪০ নম্বর অনুচ্ছেদে গ্রাম পঞ্চায়েতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ স্বশাসিত সরকারেরর একক সমূহ নির্দেশমূলক নীতিসমূহের অঙ্গ হিসাবে সংবিধানে এসেছে।

চাই বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়ার যথাযথ বাস্তবায়ন

সংবিধানের আইনগত ভাবে বলবৎযোগ্য কোনও অংশে স্থানীয় স্বশাসনের উল্লেখ নেই। এমনকী ১৮৮৪ সালের লর্ড রিপনের প্রস্তাবের মতো স্থানীয় স্বশাসিত সরকারের ধারণাকেও গ্রহণ করা হয়নি। এই কারণেই ৭৩ ও ৭৪তম সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে ঐতিহাসিক ভুল সংশোধন করে স্থানীয় সরকারগুলিকে সাংবিধানিক মর্যাদা দিতে হয়েছে।
সংবিধানে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির কাজকর্ম ও কর সংক্রান্ত দায়িত্ব বণ্টন তিনটি তালিকা অনুযায়ী করা হয়েছে। যথা --- কেন্দ্রের জন্য কেন্দ্র তালিকা, রাজ্যগুলির জন্য রাজ্য তালিকা এবং সেই সঙ্গে রয়েছে একটি যুগ্ম তালিকা, যে তালিকায় উল্লিখিত বিষয়গুলিতে কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়েরই এক্তিয়ার রয়েছে।

সংবিধান প্রণেতারা প্রধানত ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনকেই অনুসরণ করেছিলেন এবং তাঁরা সহযোগিতার নীতি প্রয়োগের পরিবর্তে একটি সাময়িক ঐতিহাসিক ব্যবস্থাপনা করতেই বেশি আগ্রহী ছিলেন। ৭৩তম ও ৭৪তম সংবিধান সংশোধনী আইন সরকারের তিনটি স্তরের কাজকর্ম ও আর্থিক দায়দায়িত্ব নতুন করে খতিয়ে দেখার পাশাপাশি এ দেশে আরও যুক্তিসঙ্গত সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার এক সুযোগ দিয়েছে। উক্ত দু'টি সংশোধনী আইনের মাধ্যমে সংবিধানে দু'টি নতুন তফশিল যুক্ত হয়েছে। যথা পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য একাদশ তফশিল এবং নগরাঞ্চলে স্বসাসিত সরকারগুলির জন্য দ্বাদশ তফশিল। রাজ্য ও যুগ্ম তালিকা থেকে এই দুই তফশিলের আওতাভুক্ত বিষয়গুলিকে বেছে নেওয়ায় সব পক্ষই সন্তুষ্ট হল। কিন্তু স্থানীয় স্বশাসিত সরকারের আর্থিক পরিসর বা আর্থিক দায়িত্বের প্রশ্নটি সম্পর্কে ধোঁয়াশা রয়েই গেল। ৭৩তম/৭৪তম সংবিধান সংশোধনীর বিধানগুলি বাস্তবে কার্যকর করা যে কতখানি অসুবিধাজনক, তা গভীর ভাবে উপলব্ধি করে কেরল সরকার। এই কারণেই কেরল সরকার একাদশ ও দ্বাদশ তফশিলের আওতাভুক্ত বিষয়গুলিকে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড ও সহায়ক কর্মকাণ্ডে ভাগ করে একটা এলোমেলো এবং দিশাহীন অবস্থাকে একটি নির্দিষ্ট রূপরেখা দেওয়ার চেষ্টা করেছে। অনেক দেরিতে ২০০৪ সালে গঠিত পঞ্চায়েতি রাজ মন্ত্রক এই গুরুতর সমস্যা উপলব্ধি করেছে এবং রাজ্যস্তরে কর্মকাণ্ডকে চিহ্নিত করার উদ্যোগ নিয়েছে। যাই হোক, কখনও না হওয়ার চেয়ে দেরিতে হওয়া ভালো। কর্মকাণ্ড নির্দিষ্ট করে চিহ্নিত করার উদ্যোগের সমান্তরাল ভাবে দায়দায়িত্ব, তহবিল এবং সেই সঙ্গে কর্মকর্তাদের ক্ষমতার হস্তান্তর যদি না হয়, তা হলে বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়ার যথাযথ বাস্তবায়ন কখনওই সম্ভব নয়।

সংবিধানের একাদশ ও দ্বাদশ তফশিল

গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের সপক্ষে যাঁরা সওয়াল করেন, এই অংশটি তাঁদের যুক্তিকে দুর্বল করে দেয়। রাজ্য তালিকার ৫ নং বিষয়টির দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক। যেখানে বলা হয়েছে, ''স্থানীয় সরকার, এর অর্থ সংবিধান এবং পুরনিগমসমূহ, উন্নয়নমূলক অছিসমূহ, জেলা পর্ষদসমূহ, খনি এলাকার বসতি কর্তৃপক্ষসমূহ এবং স্থানীয় স্বশাসন বা গ্রামীণ প্রশাসনের উদ্দেশ্যে গঠিত অন্যান্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা (ভারতের সংবিধান, সপ্তম তফশিল, তালিকা-২, রাজ্য তালিকা)'' উন্নত প্রশাসনের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ (যেটি যুক্তিসঙ্গত প্রশাসনও বটে) বর্তমানে সরকারকে সংবিধানের এই অংশটিকে বিলোপ করতে হবে এবং একাদশ ও দ্বাদশ তফশিলকে বাদ দিয়ে বিভিন্ন কর্মসূচি ও সহায়ক কর্মসূচির রূপরেখা তুলে ধরে সম্পূর্ণ নতুন স্থানীয় তালিকা তৈরির কাজ শুরু করতে হবে। এ কথা ঠিক যে পূর্বতন যোজনা কমিশন এক সময় অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত পরামর্শ দেওয়ার ক্ষমতাও এই সংস্থার ছিল না। তা সত্ত্বেও বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্রে এই কমিশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। আর সেখান থেকেই সংস্কার ও পুনর্গঠনের যে কোনও উদ্যোগ শুরু হওয়া উচিত। প্রথমত, এই কমিশন বিস্তারিত পর্যালোচনা ও সমীক্ষার উপর ভিত্তি করে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য পাঁচ বছরের পরিকল্পনার নকশা তৈরি করছে। এবং দেশ তথা দেশের অর্থনীতির সামনে সামগ্রিক অর্থনৈতিক লক্ষ্য ও পরিকল্পনা সমূহ স্থির করে দিয়েছে। আগামী দিনে এই কাজ কী ভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে, সে ব্যাপারে নীতি আয়োগকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে এবং সিদ্ধান্ত নিতে হবে নতুন ব্যবস্থা সম্পর্কেও। দ্বিতীয়ত, ভারতীয় সংবিধানের ভিত্তিতে যে যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্রের জন্ম হয়েছিল, প্রায় সেই জন্মলগ্নেই গঠিত হয়েছিল যোজনা কমিশন। এই কমিশনের দায়িত্বের মধ্যে ছিল সহায়সম্পদ বন্টন। সংবিধানের ২৮০ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কেন্দ্রীয় অর্থ কমিশন গঠনের অন্যতম কারণ কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে রাজস্ব ও ব্যয়সংক্রান্ত দায়দায়িত্বের ক্ষেত্রে নীচ থেকে উপরের স্তর পর্যন্ত ক্ষমতার অসম বন্টন। আর সেই সঙ্গে সহায়সম্পদ বন্টন।

নীতি আয়োগ : বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক বিষয়

দেশের যেটুকু উন্নয়ন হয়েছে বা যেটুকু বাকি রয়েছে,অনগ্রসরতা, পরিবেশগত ভারসাম্যহীনতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে সমান্তরাল স্তরের মধ্যে অসাম্য দূর করার প্রয়োজনীয়তাও ছিল যোজনা কমিশন গড়ে তোলার অন্যতম নেপথ্য কারণ। সংবিধানের ২৮২ নম্বর অনুচ্ছেদের বিবিধ সংস্থান অনুযায়ী যোজনা কমিশন বিলিবরাদ্দ সংক্রান্ত ক্ষমতা হাতে পেয়েছে। এটি কেন্দ্র, রাজ্য ও যুগ্ম তালিকার বাইরে অবশিষ্ট ক্ষমতা, যা বিরল পরিস্থিতিতে জনস্বার্থে অনুদান মঞ্জুর করার জন্য সংবিধানে রয়েছে। তাই যোজনা কমিশনের এই বিলিবরাদ্দ করার ক্ষমতার সংবিধানগত জোরালো ভিত্তি নেই। বিষয়ভিত্তিক হস্তান্তর হিসাবে সূচনা হলেও ১৯৬৯ সাল বা তার পরবর্তী সময়ে সহায়সম্পদ বরাদ্দকে নির্দিষ্ট সূত্রভিত্তিক করে তোলা হয়। তৎকালীন উপাধ্যক্ষ বা ডেপুটি চেয়্যারম্যান ডি আর গ্যাডগিলের নামে এই সূত্র বা ফর্মুলার নামকরণ করা হয়। এই সূত্র পরবর্তী বিভিন্ন সময়ে সংশোধিত হলেও সেখানে কমিশনের স্বাধীন ভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জায়গা রাখা হয়েছে। তা নিয়ে রাজ্যগুলির তরফে তীব্র প্রতিবাদ এসেছে। ৭৩ ও ৭৪তম সংবিধান সংশোধনীর পরে সংযোজিত ২৪৩ আই এবং ২৪৩ ওয়াই অনুচ্ছেদ কেন্দ্রীয় অর্থ কমিশনের আদলে রাজ্য এবং রাজ্যের বিভিন্ন স্তরের উপর থেকে নীচ পর্যন্ত ও সমান্তরাল ভাবে চারিয়ে যাওয়া অসাম্য দূর করতে রাজ্য অর্থ কমিশন গঠনের পথ প্রশস্ত করেছে। এ প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয়ের উপর আলোকপাত করা প্রয়োজন যে, রাজ্য অর্থ কমিশনগুলির সুপারিশের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় অর্থ কমিশন যাতে পঞ্চায়েত ও পুরসভাগুলিকে অতিরিক্ত সহায়সম্পদের জোগান দিতে

পারে সেই জন্য ৭৩ ও ৭৪তম সংবিধান সংশোধনী আইন ২৮০ নম্বর অনুচ্ছেদকে সংশোধন করেছে। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র আর্থিক ক্ষমতা বন্টনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্তরের মধ্যে যোগাযোগ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এবং পুনর্গঠনের কোনও উদ্যোগ এই বিষয়টিকে অস্বীকার করতে পারে না। তৃতীয়ত, প্রধান প্রধান নীতি রচনা ও প্রকল্পের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে যোজনা কমিশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এ ক্ষেত্রে নীতি আয়োগকেই যদি একমাত্র পরামর্শদাতা সংস্থা বা থিঙ্ক ট্যাঙ্ক হতে হয় তা হলে এ কাজের জন্য উপযুক্ত মানের গবেষণা ও আলোচনার পরিসর খোলা রাখতে হবে। কিন্তু বিচ্ছিন্ন ভাবে এ কাজ সম্ভব নয়।

ভিত্তিস্তর থেকে পরিকল্পনা রচনার পদক্ষেপ

নীতি আয়োগের কাজের বিশদ রূপরেখা এখনও প্রকাশ করা না হলেও নতুন জমানায় এ দেশে একেবারে ভিত্তিস্তর থেকে পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেওয়া হবে সে ব্যাপারে যথেষ্টই আভাস মিলেছে। ২৪৩ জি, ২৪৩ ডবলু, ২৪৩ জেড ডি বা ২৪৩ জেড ই অনুচ্ছেদেও বাধ্যতামূলক ভাবে একেবারে প্রাথমিক স্তর থেকেই পরিকল্পনা রচনা করার কথা বলা হয়েছে। ২৪৩ ডি এবং ২৪৩ ডবলু এর বিধান অনুযায়ী গ্রাম ও শহরের স্থানীয় স্বশাসিত সরকারগুলিকে এমন ক্ষমতা কর্তৃত্ব এবং দায়িত্ব দিতে হবে যাতে তারা স্বশাসিত সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করতে পারে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পরিকল্পনা রচনা করতে পারে এবং প্রস্তাবিত প্রকল্পগুলির রূপায়ণ ঘটাতে পারে। ২৪৩ জেডি অনুচ্ছেদে সমস্ত রাজ্যকে জেলা পরিকল্পনা কমিটি এবং মহানগর এলাকার জন্য মহানগর পরিকল্পনা কমিটি গঠন করতে বলা হয়েছে। জেলার পঞ্চায়েত ও পুরসভাগুলির তৈরি পরিকল্পনাগুলিকে একত্রিত ভাবে সংশ্লিষ্ট জেলার জন্য একটি খসড়া উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করাই জেলা পরিকল্পনা কমিটির কাজ এবং এই খসড়া পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবে সুসংহত স্থান ও অবস্থানগত পরিকল্পনা ও দক্ষতার সঙ্গে প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের ব্যবস্থাও করতে হবে। রাজ্য স্তর ও স্থানীয় স্বশাসিত সরকার স্তরে উপযুক্ত নীতি গ্রহণের মাধ্যমে এই খসড়া পরিকল্পনাটি বাস্তবে কার্যকর করতে হবে। আর সে জন্য যথাযথ প্রতিষ্ঠানিক এবং পদ্ধতিগত ব্যবস্থাও নিতে হবে।
এ দেশে ২.৫ লক্ষ পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠান এবং ৩৮৪২টি শহরাঞ্চলীয় স্বশাসিত সরকারে ৩০ লক্ষেরও বেশি মানুষ প্রতিনিধিত্ব করছেন। এই ব্যাপক গণতান্ত্রিক ভিত্তি বিশ্বের অন্য কোনও দেশে নেই। গণতান্ত্রিক ভাবে একেবারে প্রাথমিক স্তর থেকে পরিকল্পনা রচনার এই অনন্য সুযোগ জাতীয় স্বার্থে কাজে লাগানো যেতে পারে। এ দেশে ভিত্তিস্তর থেকে ক্রমশ উচ্চপর্যায়ের যে পরিকল্পনা রচনার জন্য গ্রামসভা, জেলা পরিকল্পনা কমিটি, রাজ্য অর্থ কমিশন তৈরি হয়েছে বা জনসাধারণের প্রতিনিধিত্বের অন্য পথ খুলে গিয়েছে তা একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য পূরণের পথে প্রচলিত ব্যবস্থাকে উজ্জীবিত করেছে।

কেরলের দৃষ্টান্ত

বটম আপ প্ল্যানিং

পরিকল্পনা করবে গ্রামের সাধারণ মানুষ এমনটা অতিবড় গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষেরও মেনে নিতে অসুবিধা হয়েছিল। কিন্তু কালেক্রমে দেখা গেল নীচের থেকে যে পরিকল্পনার জন্ম সেটাই সঠিক পথের দিশা দেখায়।
জনসাধারণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা তথা ভিত্তিস্তর থেকে উচ্চপর্যায়ের জন্য বটম আপ প্ল্যানিং পরিকল্পনা রচনার উদ্যোগের ব্যাপারে সচেতনতা প্রসারের জন্য কেরলে প্রথম প্রচারাভিযান চালানো হয়েছিল। পরে সেন কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে এই বিষয়টিকে একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া হয়। প্রসঙ্গত সেন কমিটি ছিল বিশেষজ্ঞ কমিটি এবং এই কমিটি প্রচারাভিযান চলাকালীনই তার কাজ করেছিল। গ্রামসভা যে প্রয়োজনীয়তাগুলি অনুভব করে সেগুলি চিহ্নিত করা ও খতিয়ে দেখা থেকে শুরু করে জেলা পরিকল্পনা কমিটির চূড়ান্ত প্রশাসনিক অনুমোদন পর্যালোচনা করে কেরল প্রতিনিধিত্বমূলক পরিকল্পনার এক বহুস্তরীয় প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করেছে। এই ব্যবস্থায় প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েত ও পুরসভাকে যে ভাবে উন্নয়ন প্রতিবেদন তৈরি ও মুদ্রণ করতে হয় তা কম কথা নয়। এই উন্নয়ন প্রতিবেদনগুলিতে প্রত্যেক এলাকার সহায়সম্পদের বিস্তারিত তালিকা থাকে এবং সেই সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের লক্ষ্যেও আলোচনা করা হয়। এই আলোচনাকে উন্নয়নমূলক আলোচনাচক্র ডেভেলপমেন্ট সেমিনার বলে অভিহিত করা হয়। গ্রাম পঞ্চায়েত ও পুরসভাগুলি ক্ষেত্রভিত্তিক বিভিন্ন টাস্ক ফোর্স (পরে এগুলির নতুন নাম দেওয়া হয় কর্মীগোষ্ঠী, প্রতি স্বশাসিত সরকারেরর জন্য ১০-১১ জনের কর্মীগোষ্ঠী) গঠন করে তাদের উপর বিভিন্ন প্রকল্প তৈরির দায়িত্ব দেয়। দু'জন গবেষকের মতে সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হল প্রতিবেদন নিয়ে আলোচনা করার জন্য প্রতি গ্রাম পঞ্চায়েত ও পুরসভায় উন্নয়নমূলক আলোচনা চক্রের আয়োজন করা, যাতে গ্রামসভা স্তরে ওয়ার্ডভিত্তিক উন্নয়নের যে আলোচনার সূচনা হয় তাকে 'গ্রামের উচ্চতর পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া যায়' (ইশাক এবং ফ্রাঙ্ক ২০০০)। জনসাধারণের পরিকল্পনা প্রচারাভিযানের অঙ্গ হিসেবে গ্রামসভা, রাজনৈতিক দলের নেতা, সরকারি কর্মকর্তা, স্থানীয় বিশেষজ্ঞদের নিয়ে প্রায় পাঁচ লক্ষ মানুষ যে ভাবে

উন্নয়নের আলোচনাচক্রে অংশগ্রহণ করেছিলেন তা বিকেন্দ্রীভূত গণতান্ত্রিক কাঠামোয় আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান ও প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যবস্থার গুরুত্বকেই তুলে ধরে।

চাই স্থানীয় সরকারগুলির হাতে মুক্ত তহবিল

বিকেন্দ্রীকৃত পরিকল্পনার কোনও ত্রুটি বিচ্যুতি নেই এ কথা ভুল। তা সত্ত্বেও এই বিষয়গুলিকে যে ভাবে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া হয়েছে তা নিঃসন্দেহে একটা বড় সাফল্য। পরিকল্পনা প্রচারাভিযান শুরুর দিনগুলিতে রাজ্য পরিকল্পনা পর্ষদ মালায়ালাম ভাষায় বিস্তারিত নির্দেশিকা পুস্তিকা প্রকাশ করেছিল এবং পরিকল্পনা প্রকল্প তৈরিতে জনসাধারণকে সাহায্য করেছিল। জেলা পরিকল্পনা পদ্ধতির বিষয়ে কেরল সরকারের (২০০৯) একটি অধ্যায় রয়েছে এবং সেই সঙ্গে রয়েছে কোল্লম জেলা পরিকল্পনার যাবতীয় নথিপত্র। এ দেশে নতুন সরকার যদি একেবারে ভিত্তিস্তর থেকে শুরু করে উচ্চপর্যায়ের পরিকল্পনা বা বটম আপ প্ল্যানিংয়ের ব্যাপারে সত্যিই আন্তরিক হয় তা হলে এ রাজ্যের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে পারে। এ প্রসঙ্গে অন্যান্য উদ্যোগের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের বটম আপ প্ল্যানিংয়ের উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। পশ্চিমবঙ্গে ডিএফআইডির সহায়তায় বাছাই করা কিছু গ্রাম পঞ্চায়েতে ২০০৬-৭ সালে এই উদ্যোগের সূচনা হয়েছিল। সংবিধানে পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠান ও শহরের স্থানীয় সরকারগুলিকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যে পরিকল্পনা করতে বলা হয়েছে, তার গুরুত্ব অন্য। এটি এক ধরনের সামগ্রিক পরিকল্পনা। বিভাগীয় স্তরে এই ধরনের পরিকল্পনা রচনা ও রূপায়ণে এই রীতি কখনওই সঠিক পদক্ষেপ হবে না। ভারতে এই দফতর ও বিভাগের ফাঁসই সব চেয়ে বড় অভিশাপ হয়ে দেখা দিয়েছে। ভিত্তিস্তর থেকে পরিকল্পনার এই উদ্যোগ যতই জোর কদমে চলুক না কেন, পঞ্চায়েতগুলির হাতে প্রকল্পভিত্তিক তহবিল ছাড়া যদি অন্য কোনও তহবিল না থাকে তা হলে এই উদ্যোগ অর্থহীন হয়ে যাবে। এ প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ ও কর্ণাটকের প্রকল্প হস্তান্তরভিত্তিক তথাকথিত বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়ায় দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। স্থানীয় সরকারগুলির হাতে পূর্ব নির্ধারণযোগ্য মুক্ত তহবিল বা আনটায়েড ফান্ড-এর জোগান থাকতে হবে, অর্থাৎ যে তহবিলের অর্থে নিজের স্বাধীনতা অনুযায়ী পরিকল্পনা ও অগ্রাধিকারগুলিকে চিহ্নিত করা যাবে। স্থানীয় সরকারগুলি সঠিকভাবে কাজ করলে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার দিক দিয়ে কোনও ত্রুটি হয় না। তহবিল সামলানোর কাজটিও তারা যথার্থভাবেই সম্পন্ন করে।

নীতি আয়োগের কর্তব্য

নীতি আয়োগ অবিলম্বে এক দেশব্যাপী অবস্থা সংক্রান্ত প্রতিবেদন তৈরির দায়িত্ব নিতে পারে ও ২০০৮ সালে পরিকল্পনার জন্য তৈরি নির্দেশিকা সহ যোজনা কমিশনের বিভিন্ন প্রচেষ্টা নিয়ে বিতর্ক ও আলাপ আলোচনা চালাতে পারে এবং তারপর স্থানীয় বৈচিত্রগুলিকে স্থান দিয়ে একটি রূপরেখা তৈরির লক্ষ্যে কাজ করতে পারে। দেশের ৬৪০টি জেলাই যদি শেষ পর্যন্ত একটি দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্যের ভিত্তিতে জেলা পরিকল্পনা তৈরি করে এবং সেই পরিকল্পনার অন্তর্গত মাঝারি মেয়াদের লক্ষ্যগুলির ভিত্তিতে বার্ষিক পরিকল্পনা রচনা করা যায়, তা হলে এ দেশে প্রকৃত অর্থেই বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যের প্রকাশ ঘটবে। স্থানীয় সরকার স্তরে ভূস্তরের চিহ্নিতকরণ বা জিওলোকেশন, মৃত্তিকা, ভূগর্ভস্থ জল, শস্য, নদী অববাহিকা, জলবিভাজিকা ইত্যাদি ক্ষেত্রে ভৌগোলিক তথ্যভিত্তিক (জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন বেসড ডেটা) ব্যবস্থাপনার কাজে এ দেশ এতটাই উন্নতি করছে যে, স্থানীয় স্তরের বিজ্ঞানসম্মত পরিকল্পনাকে মোটেই অলীক স্বপ্ন বলে ভাবা যাবে না। এর পরিপূরক হিসাবে জনগণনা এবং পরিবারভিত্তিক আর্থসামাজিক অবস্থার তথ্য (সামগ্রিক ভাবে সমীক্ষার কাজে বিদ্যালয় শিক্ষকদের দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে) হাতে পাওয়া গেলে পারিবারিক স্তরে পূর্ণাঙ্গ ছবি মিলবে, যা ভিত্তিস্তরের পরিকল্পনার খুঁটি হয়ে উঠতে পারবে। কিন্তু আসল প্রশ্নটা হল, দেশে জেলা পরিকল্পনা কমিটিগুলি যে ভাবে কাজ করে তাতে তাদের কাজের গঠন কাঠামোর সমস্ত স্তরে অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার উপযুক্ত রাজনৈতিক সামাজিক ও আইনি প্রযুক্তিগত ক্ষমতা কি রয়েছে? নীতি আয়োগ এই বিষয়টি নিয়ে চিন্তাভাবনা করলে ভালো হয়। জনসাধারণের পরিকল্পনা প্রচারাভিযানের অঙ্গ হিসেবে গ্রামসভা, রাজনৈতিক দলের নেতা, সরকারি কর্মকর্তা, স্থানীয় বিশেষজ্ঞদের নিয়ে প্রায় পাঁচ লক্ষ মানুষ যে ভাবে উন্নয়নের আলোচনাচক্রে অংশগ্রহণ করেছিলেন তা বিকেন্দ্রীভূত গণতান্ত্রিক কাঠামোয় আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান ও প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যবস্থার গুরুত্বকেই তুলে ধরে। নীতি আয়োগ এই দিকে গুরুত্ব দিয়ে কাজ করলে অনেক দুরূহ সমস্যার সমাধান খুঁজে পাওয়া সম্ভব।

যুক্তিসঙ্গত হস্তান্তর ব্যবস্থা চাই

যুক্তিসঙ্গত, দক্ষ ও ন্যায় ভাবে আর্থিক দায়দায়িত্বের হস্তান্তর একটি উন্নত সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থার অত্যাবশ্যক শর্ত। কিন্তু ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় আর্থিক ক্ষমতা বণ্টনের সব চেয়ে দুর্বল জায়গা হল বহু রকম প্রণালী (চ্যানেল) ও তাদের বিবিধ লক্ষ্য ও শর্তাবলীর উপস্থিতি। এর পরিণামে পরস্পর- বিরোধী অগ্রাধিকার ও ব্যর্থ ফলাফল। যোজনা কমিশনের

বিলিবরাদ্দের ক্ষমতা বিলোপ করলেই সমস্যার সমাধান হবে না। মোট বাজেট সহায়তার শতাংশের হিসাবে কেন্দ্রীয় সহায়তা প্রকল্পগুলি (সিএসএস) অংশ ক্রমশই বেড়েছে। বিকে চতুর্বেদি কমিটির (২০১১) সুপারিশ মেনে এই ধরনের প্রকল্পের সংখ্যা কমানো হলেও আজও এগুলির উপস্থিতি যথেষ্টই। দেশে আরও ন্যায্য ও যুক্তিসঙ্গত হস্তান্তর ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে গেলে এই প্রকল্পগুলিরই সমস্যার সমাধান করে কী ভাবে বাস্তবোপযোগী হস্তান্তর ব্যবস্থার অঙ্গ করে তোলা যায়, তা সবার আগে স্থির করতে হবে। কেন্দ্রীয় সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পগুলির রূপায়ণকারী রাজ্যগুলির তরফে পাল্টা অর্থ প্রদানের যে নীতি তার ফল হয়েছে ভয়াবহ। এতে তাদের অগ্রাধিকারগুলি ভীষণ ভাবেই মার খেয়েছে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সামগ্রিক দিক থেকে এগিয়ে থাকা কেরলের মতো রাজ্য এবং ঝাড়খণ্ড ও ওড়িশার মতো অনগ্রসর এলাকাকে একই সর্বভারতীয় মানদণ্ডে বিচার করা হয়েছে এবং সর্বোপরি একতরফা ভাবে বিভিন্ন প্রকল্প ঘোষণা করে রাজ্যগুলির উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই সমস্যাগুলির সমাধানের আশু প্রয়োজন।

আর্থিক দিক থেকে ভারত বিশ্বে সর্বাধিক কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র। কমিউনিস্ট চিনের এককেন্দ্রিক সরকারও ভারতের চেয়ে অনেক বেশি বিকেন্দ্রীভূত। হস্তান্তর ব্যবস্থাপনার ঐতিহাসিক পরম্পরার প্রেক্ষিতে এই দেশ বিভিন্ন স্তরে (নীচ থেকে উপর পর্যন্ত) বা সমান্তরালে যে অসাম্য রয়েছে, তা ক্রমান্বয়ে কমিয়ে আনার ভার কি শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় অর্থ কমিশনের উপর চাপিয়ে দেওয়া উচিত? যা-ই হোক না কেন, এই কয়েক বছরে উন্নয়নের প্রশ্নে ভারত নির্দিষ্ট লক্ষ্যের কাছে এসেছে, নাকি নির্দিষ্ট লক্ষ্যের থেকে সরে গিয়েছে তা নতুন করে খতিয়ে দেখা প্রয়োজন।

মেটাতে হবে নাগরিকদের মৌলিক পরিষেবার দাবি

বিকেন্দ্রীকৃত ব্যবস্থাকে আরও সুসংহত ভাবে গড়ে তোলার স্বার্থে এ বার নীতি আয়োগের নতুন ভাইস চেয়্যারম্যান অরবিন্দ পানাগাড়িয়ার দায়িত্ব এ ব্যাপারে নতুন করে সমীক্ষার নির্দেশ দেওয়ার। অবশ্যই পরামর্শদাতা সংস্থাগুলি অনুমানের ভিত্তিতে কাজ করতে পারে না। স্বাধীনতার ৬৮ বছর পরেও স্বচ্ছ ভারত প্রচারাভিযানের অঙ্গ হিসাবে দেশের প্রধানমন্ত্রীকে যখন ঝাঁটা হাতে রাস্তা সাফাইয়ের কাজে নামতে হয়, তখন চলতি উন্নয়নের ধরন নিয়ে সত্যিই লজ্জা লাগে।

কার অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে এ দেশের ভাগ্য নির্ধারিত হয়েছিল, এই ঘোরালো প্রশ্নের জবাব পাওয়ার প্রয়োজন কি নেই? পঞ্চায়েতগুলিকে শক্তিশালী করে তোলা এবং ৭৩/৭৪তম সংশোধনীতে বর্ণিত বাসস্থান প্রত্যেক নাগরিকের কাছে স্যানিটেশন, পানীয় জল, আবাসন, বিদ্যুৎ যোগাযোগ ব্যবস্থার মতো মৌলিক সুযোগসুবিধা এবং অন্যান্য জনপরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার সারমর্ম অনুসরণ করার দিকে অবিলম্বে নজর দেওয়া প্রয়োজন। স্থানীয় স্বশাসিত সরকারগুলিকে নিজস্ব সহায় সম্পদ সংগ্রহে উৎসাহিত করা প্রয়োজন। কিন্তু পঞ্জাব, রাজস্থান ও হরিয়ানা সরকার যে ভাবে সম্পত্তিকর বিলোপ সহ আরও যে কয়েকটি পশ্চাৎমুখী পদক্ষেপ নিয়েছে, তা নিয়ে গভীর চিন্তার অবকাশ রয়ে যায়। অথচ বিশ্বে ৮০ শতাংশ দেশেই স্থানীয় সরকারগুলির কাছে আয়ের মূল উৎস সম্পত্তি কর। তবে স্থানীয় স্বশাসিত সরকারগুলি যাতে রাজস্ব সংগ্রহের একই রকম প্রচেষ্টা নিয়ে প্রত্যন্ত অঞ্চলের আদিবাসী থেকে শুরু করে নয়াদিল্লির অভিজাত নাগরিকদের তুলনীয় জনপরিষেবা দিতে পারে, সে জন্য এমন এক হস্তান্তর ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা জরুরি যা তাদের আর্থিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করবে। ত্রয়োদশ অর্থ কমিশন যে সাধারণ কর্মকুশলতা অনুদানের সুপারিশ করেছে তা সমতাবিধান অনুদান না হলেও সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের পথে বড় পদক্ষেপ। তবে তার জন্য পরবর্তী কাজ জারি রাখতে হবে। কানাডা, অস্ট্রেলিয়ার মতো যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের তুলনায় নিম্ন স্তর থেকে উপরিস্তরের অসাম্য অনেক কম। এ দুই যুক্তরাষ্ট্রেই সমতাবিধান অনুদানের রীতি প্রচলিত। নীতি আয়োগ এবং ভবিষ্যতের কেন্দ্রীয় অর্থ কমিশনগুলি এই বিষয়টি মাথায় রাখতে পারে। তবে সাধারণ নাগরিকদের মৌলিক পরিষেবার দাবি না মিটিয়ে রাজ্যগুলিকে ফিসকাল রেসপনসিবিলিটি অ্যান্ড বাজেট ম্যানেজমেন্ট আইনের শর্তগুলি মানতে উৎসাহিত করা অসাংবিধানিক না হলেও অনুচিত।

তথ্যসূত্র- উইকিপিডিয়া